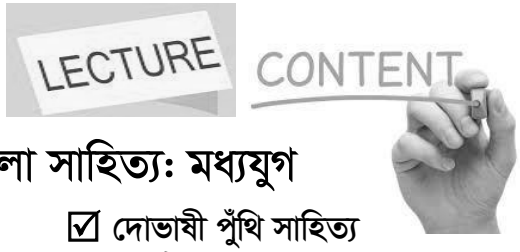

বাংলা সাহিত্য: মধ্যযুগ

- ☑ বিগত বছরের বিসিএস প্রশ্ন
- ☑ রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান
- ☑ অনুবাদ সাহিত্য
- ☑ লোক সাহিত্য
- ☑ দোভাষী পুঁথি সাহিত্য
- ☑ মর্সিয়া সাহিত্য
- ☑ কবিগান

বাংলা সাহিত্য: মধ্যযুগ | রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

বিগত BCS প্রশ্নাবলী

০১. রোসাঙ্গ-রাজসভা কোথায় অবস্থিত ছিল? বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই রাজসভা কেন প্রাসঙ্গিক? (৩৭ ও ৩৫তম BCS)
০২. রোমাঞ্চধারার একজন মুসলিম কবির কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করুন। (৩৬তম BCS)
০৩. 'লায়লী মজনু' কাব্যের প্রেমের স্বরূপ আলোচনা করুন। (৩৬তম BCS)
০৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রোসাঙ্গ রাজসভার প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করুন। (৩৫তম BCS)
০৫. আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য চর্চা করেছেন এমন দুইজন লেখকের নাম লিখুন। (৩৪তম BCS)
০৬. আলাওলকে 'পণ্ডিত কবি' বলা হয় কেন? (৩২তম BCS)
০৭. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্যধারার তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। (৩০তম BCS)
০৮. রোসাঙ্গ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় কী ধরনের সাহিত্য রচিত হয়? সে সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। (২৯তম BCS)
০৯. রচয়িতাসহ মধ্যযুগের পাঁচটি রোমাঞ্চমূলক উপন্যাসের নাম লিখুন এবং এ শ্রেণির কাব্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। (২৮ ও ২৭তম BCS)
১০. আলাওল রচিত তিনটি কাব্যের নাম লিখুন। (২৫তম BCS)
১১. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম কবি কে? (২৫তম BCS)
১২. 'তোহফা' কাব্যটি কে রচনা করেন? কাব্যটি কোন ভাষা থেকে অনূদিত? (১৭তম BCS)
১৩. মধ্যযুগের কোন কাব্য প্রথম এক কবি শুরু করেন এবং আরেক কবি শেষ করেন? (১৭তম BCS)
১৪. 'ইউসুফ-জুলেখা' ও 'লায়লী-মজনু' কাব্যের উপাখ্যানসমূহ কোন দেশের? (১৭তম BCS)
১৫. শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত একটি কাব্যের নাম লিখুন এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঐ কাব্যের গুরুত্ব নির্দেশ করুন। (১৫তম BCS)
১৬. 'লায়লী-মজনু' কাব্যের রচয়িতা কে? এটি কি মৌলিক না অনুবাদ? (১৫তম BCS)
১৭. ফকির গরীবুল্লাহ রচিত দুটি গ্রন্থের নাম লিখুন। (১৩তম BCS)
১৮. আলাওলের 'পদ্মাবতী' কোন ভাষার, কোন কবির এবং কোন গ্রন্থের অনুবাদ? (১৩তম BCS)
১৯. 'মধুমালতী' কাব্যের অনুবাদক কে? এটি কোন ভাষা থেকে অনূদিত হয়েছে? (১১তম BCS)
২০. আলাওলের শ্রেষ্ঠ কাব্যের নাম কী? (১০তম BCS)
২১. 'ইউসুফ-জুলেখা' কাব্যের রচয়িতা কে ছিলেন? (১০তম BCS)
২২. দৌলত উজির বাহরাম খানের কাব্যের নাম কী? (১০তম BCS)

আলোচ্য বিষয়

মধ্যযুগ: রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

০১. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্যধারার বৈশিষ্ট্য লিখুন।
০২. শাহ মুহম্মদ সগীর, বাহরাম খান এবং আলাওলের পৃষ্ঠপোষকের নাম লিখুন।
০৩. রোসাঙ্গ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় কী ধরনের সাহিত্য রচিত হয়? সে সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
০৪. আলাওল রচিত তিনটি কাব্যের নাম লিখুন।
০৫. আলাওলের শ্রেষ্ঠ কাব্য কোনটি এবং কেন?

STUDENT STUDY মধ্যযুগ: রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

বাংলার মুসলমান কবিগণের মধ্যে প্রাচীনতম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর চতুর্দশ শতকের শেষে বা পঞ্চদশ শতকের প্রথমে 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য রচনা করার মাধ্যমে এই ধারার প্রবর্তন করেন। তারপর অসংখ্য কবির হাতে এই কাব্যের বিকাশ ঘটে এবং অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। এই দীর্ঘ সময় ধরে মুসলমান কবিগণের স্বতন্ত্র অবদান ব্যাপকতা ও ঔজ্জ্বল্যে বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা সাহিত্যকে আরবি, ফারসি, হিন্দি, সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে যে নতুন ঐতিহ্যের প্রবর্তন হয় তার তুলনা নেই। পরবর্তী পর্যায়ে দোভাষী পুঁথির মধ্যে এই ধরনের বিষয় স্থান পেলেও তাতে কোনো ঔজ্জ্বল্য পরিলক্ষিত হয় না। রোমান্টিক কাব্যধারায় যে সব উল্লেখযোগ্য কবি তাঁদের প্রতিভার নিদর্শন রেখে গেছেন তার একটা তালিকা নিম্নরূপে দেওয়া যেতে পারে:

কাল	কবি	কাব্য
পনের শতক	শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ-জুলেখা
ষোল শতক	দৌলত উজির বাহরাম খান মুহম্মদ কবীর সাবিরিদ খান দোনাগাজী চৌধুরী	লায়লী মজনু মধুমালতী হানিফা-কায়রাপরী, বিদ্যাসুন্দর সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল
সতের শতক	দৌলত কাজী আলাওল কোরেশী মাগন ঠাকুর আবদুল হাকিম নওয়াজিস খান	সতীয়মনা-লোরচন্দ্রানী পদ্মাবতী, সপ্তপয়কর চন্দ্রাবতী লালমতী সয়ফুলমুলুক গুলে বকাওলী
আঠার শতক	মুহম্মদ মুকীম শেখ সাদী	মৃগাবতী গদামল্লিকা

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্যধারার বৈশিষ্ট্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিগণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান এই রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। এই শ্রেণির কাব্য মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে। ফারসি বা হিন্দি সাহিত্যের উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে রচিত অনুবাদমূলক প্রণয় কাব্যগুলোতে প্রথমবারের মত মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। মধ্যযুগের কাব্যের ইতিহাসে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর আধিপত্য ছিল, কোথাও কোথাও লৌকিক ও সামাজিক জীবনের ছায়াপাত ঘটলেও দেবদেবীর কাহিনির প্রাধান্যে তাতে মানবীয় অনুভূতির প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এই শ্রেণির কাব্যে মানব-মানবীর প্রেমকাহিনি রূপায়িত হয়ে গতানুগতিক সাহিত্যের ধারায় ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করেছে। মুসলমান কবিগণ হিন্দুধর্মাচারের পরিবেশের বাইরে থেকে মানবিক কাব্য রচনায় অভিনবত্ব দেখান। রোমান্টিক কবিরা তাঁদের কাব্যে ঐশ্বর্যবান, প্রেমশীল, সৌন্দর্যপূজারী, জীবনপিপাসু মানুষের ছবি এঁকেছেন।

১. প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক ও দেবতাকেন্দ্রিক সাহিত্য ছেড়ে এই কাব্যগুলোতে প্রথমবারের মতো মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়।
২. এ কাব্যের কাহিনি বাঙালির ঘরের নয়, বাইরে থেকে সংগ্রহ করে বাংলা কাব্যে রূপদান করা হয়েছে।
৩. বাংলাদেশের সাহিত্যের গতানুগতিক ঐতিহ্যের বাইরে নতুন ভাবনা-চিন্তা ও রসমাধুর্যের পরিচয় ও কাব্যধারায় ছিল স্পষ্ট।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্যধারার কবিগণ

শাহ মুহম্মদ সগীর

↘ ইউসুফ-জোলেখা:

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান কবি হিসেবে শাহ্ মুহম্মদ সগীর বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। তিনি গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৯৩-১৪০৯ খ্রিস্টাব্দ) ইউসুফ-জোলেখা কাব্য রচনা করেন। 'ইউফুফ-জোলেখা' কাব্যের বিষয়বস্তু ইউসুফ ও জোলেখার প্রণয়কাহিনি। কাব্যের আরম্ভে আল্লাহ্ ও রাসুলের বন্দনা, মাতাপিতা ও গুরুজনের প্রশংসা এবং রাজবন্দনা স্থান পেয়েছে। তৈমুস বাদশাহের কন্যা জোলেখা আজিজ মিশরের সঙ্গে বিবাদ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও ক্রীতদাস ইউসুফের প্রতি গভীরভাবে প্রেমাসক্ত হন। নানাভাবে আকৃষ্ট করেও তিনি ইউসুফকে বশীভূত করতে পারেন নি। বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে ইউসুফ মিশরের অধিপতি হন। ঘটনাক্রমে জোলেখা তখনও তাঁর আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেননি এবং পরে ইউসুফের মনেরও পরিবর্তন ঘটে। ফলে তাঁদের মিলন হয়। কাব্যে এই প্রধান কাহিনির সঙ্গে আরও অসংখ্য উপকাহিনি স্থান পেয়েছে।

শাহ মুহম্মদ সগীর ব্যতীত 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যের অন্যান্য রচয়িতা হচ্ছেন আবদুল হাকিম, ফকির গরীবুল্লাহ, গোলাম সফাতউল্লাহ, সাদেক আলী ও ফকির মুহম্মদ।

দৌলত উজির বাহরাম খান

↘ লায়লী-মজনু:

দৌলত উজির বাহরাম খান বিরচিত লায়লী-মজনু কাব্য রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্যধারায় কাব্যধারায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে স্থান পেয়েছে। কবি দৌলত বাহরাম খান রচিত 'লায়লী-মজনু' কাব্য ফারসি জামীর লায়লী-মজনু নামক কাব্যের ভাবানুবাদ। লায়লী ও মজনুর প্রেমকাহিনি সারা বিশ্ব জুড়ে পরিচিত। এই কাহিনির মূল উৎস আরবি লোককাঁথা। আমির-পুত্র কয়েস বাল্যকালে বণিক-কন্যা লায়লীর প্রেমে মজনু পাগল নামে খ্যাত হয়। লায়লীও মজনুর প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু উভয়ের বিবাহে আসে প্রবল বাধা; ফলে মজনু পাগলরূপে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে থাকে। অন্যদিকে লায়লীর অন্যত্র বিয়ে হলেও তার মন থেকে মজনু সরে যায় নি। তাদের দীর্ঘ বিরহজীবনের অবসান ঘটে করুণ মৃত্যুর মাধ্যমে। এই মর্মস্পর্শী বেদনাময় কাহিনি অবলম্বনেই লায়লী-মজনু কাব্য রচিত।

দৌলত উজির বাহরাম খান তাঁর কাব্যে নিজের আবির্ভাব কাল সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রদান করেননি। তবে পীর ও রাজপ্রশস্তি থেকে পণ্ডিতেরা কবির কাল বা কাব্য রচনার কাল সম্পর্কে অনুমান করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে পণ্ডিতগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কবি ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে নিজাম শাহ সুর কর্তৃক দৌলত উজির উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ড. মুহম্মদ এনামুল হক এই সময়কাল বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত করেন যে, ১৫৬০ থেকে ১৫৭৫ সালের মধ্যে কাব্যের রচনাকাল হতে পারে। কবি জানিয়েছেন, গৌড়ের অধীনতা দূর হবার পরে নিযাম শাহ নৃপতি হয়েছিলেন এবং তাঁর দৌলত উজির থাকাকালে তিনি 'লায়লী-মজনু' রচনা করেছেন। নিযাম শাহ সম্ভবত একজন সামন্তজমিদার ছিলেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে 'লায়লী-মজনু' কাব্যের রচনাকাল ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দ। কাব্যটি কবির পরিণত বয়সের রচনা।

↘ লায়লীর রূপবর্ণনায় কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়:

দিনে দিনে বাড়ে কন্যা যেন চন্দ্রকাল।
পদ্ম যেন বিকশিলা অধিক উজ্জ্বলা ॥

বাহরাম খানের কাব্যে সুভাষিত বুলি বা সদুক্তি বা প্রাবচনিক তত্ত্বকথার নিদর্শন প্রচুর। অল্প কথায় চিরন্তন সত্য প্রকাশ করা শ্রেষ্ঠ কবিগণের একটি বিশেষ গুণ।

কিছু দৃষ্টান্ত:

বামন হইয়া চাহ ছুঁইতে আকাশ।
কাকের মুখেত যেন সিন্ধুরিয়া আম।
কুকুরের গলে যেন অপসর ভূষণ।

কবির এসব সদুক্তির মাধ্যমে তাঁর বৈদগ্ধ্য, মনীষা, কবিত্ব, চিন্তাশীলতা ও তত্ত্ব-প্রবণতার পরিচয় লাভের সঙ্গে সঙ্গে মানব জীবন ও জগতের গভীরতর তথ্য আর চিরন্তন সত্যের সাক্ষাৎ মেলে।

সাবিরিদ খান

ক. বিদ্যাসুন্দর ও খ. হানিফা ও কয়রাপরী:

রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের কবি হিসেবে সাবিরিদ খানের নাম উল্লেখ্যযোগ্য। কেউ কেউ কবির নাম শাহ বারিদ খান মনে করেন। তবে কবির প্রায় সব ভণিতায় তাঁর নামের বানান 'সাবিরিদ' পাওয়া যায়। তিনি কালিকামঙ্গল কাব্যধারার 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনির অন্যতম কবি রূপে স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। 'হানিফা ও কয়রাপরী' নামে তাঁর অপর একটি প্রণয়কাব্য রয়েছে। তিনি রসুলবিজয় কাব্যেরও রচয়িতা।

দোনা গাজী চৌধুরী

সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল:

বাংলা রোমান্টিক কাব্য ধারার 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল' অন্যতম বিশিষ্ট কাব্য। দোনা গাজী চৌধুরী, আলাওল, ইব্রাহিম ও মালে মুহম্মদ এই প্রেমকাহিনি অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছিলেন। তন্মধ্যে আলাওলের কাব্যই সমধিক পরিচিত। দোনা গাজীর কাব্যের একটিমাত্র পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে এবং তাও খণ্ডিত। এ থেকে কবির ব্যক্তিপরিচয় উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়নি। কবি একটি ভণিতায় উল্লেখ করেছেন:

> **দোনা গাজী চৌধুরী দোল্লাই নামে দেস।**
> **রছিল বিরহে পুঁতি চিত্তের য়াবেস ॥**

দোনা গাজী আলাওলের পূর্ববর্তী কবি। কবির বাসস্থান চাঁদপুর জেলার কোনো এক গ্রামে ছিল বলে অনুমান করা হয়। ড. মুহম্মদ এনামুল হক কবির কাল নির্ণয় করতে গিয়ে লিখেছেন 'আমাদের ধারণা, কবি দোনা গাজী ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।'

'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্যের কাহিনির আদি উৎস আলেফ লায়লা বা আরব্য উপন্যাস। এই কাহিনি অবলম্বনে ফারসিতে কাব্য রচিত হয়েছিল। দোনা গাজী ফারসি কাব্য অনুসরণেই এ কাব্য রচনা করেন। রোমান্টিক কাব্য হিসেবে এর পরিচয়।

মুহম্মদ কবীর

মধুমালতী:

মুহম্মদ কবীরের রচনা হিসেবে কেবল 'মধুমালতী' কাব্যের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন পর্যন্ত তাঁর অন্য কোনো কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি। মধুমালতীর কাহিনি দিয়ে মুহম্মদ কবীরই প্রথম কাব্য রচনা করেন এবং তিনি 'মধুমালতী' কাব্য রচনাকারীগণের মধ্যে প্রধান কবি হিসেবে বিবেচনার যোগ্য।

প্রাপ্ত পুথিতে কবির ব্যক্তি পরিচয় নেই, রচনায় কালজ্ঞাপক উক্তি অনুপস্থিত, কোনো পৃষ্ঠপোষকের কথাও তাতে উল্লেখ নেই। এসব কারণে কবি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানার সুযোগ নেই। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিটি চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত। চট্টগ্রামের কতিপয় আঞ্চলিক শব্দ কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এসব দিক বিবেচনা করে ড. আহমদ শরীফ কবিকে চট্টগ্রামের বলে অনুমান করেছেন। ড. মুহম্মদ এনামুল হক একবার মনে করেন যে, ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে কাব্যটি রচিত। অন্য এক উৎস থেকে তিনি কাব্যের রচনাকাল ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে বলে ধারণা করেছেন। কাব্যের ভাষায় প্রাচীনতার নিদর্শন আছে বলে তাঁর এই অনুমান।

তবে সংস্কৃত ভাষায় এ নামে কোনো কাব্যের অস্তিত্বের কথা জানা যায়নি। হিন্দি ও ফারসিতে কয়েকজন কবি মধুমালতী কাব্য রচনা করেছিলেন। এই পর্যায়ের প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ কবি মনঝন সম্ভবত কোনো লোকথাথা অবলম্বনে 'মধুমালতী' কাব্যের রূপ দেন। মধুমালতী কাব্য রচনা করতে গিয়ে মুহম্মদ কবীর তাঁর একমাত্র পূর্ববর্তী কবি মনঝনের অনুসরণ করেছেন বলে অনুমান করা হয়।

নওয়াজিস খান

গুলে বকাওলী:

বাংলা রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের ধারায় 'গুলে বকাওলী' কাব্যটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গদ্যে ও পদ্যে 'গুলে বকাওলী' প্রেমকাহিনি বাংলায় পরিবেশিত হয়েছে এবং বিংশ শতাব্দীতেও সাহিত্যরূপ লাভ করায় এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা প্রমাণিত। বাংলা ভাষা ব্যতিত হিন্দি, ফারসি, উর্দু ইত্যাদি ভাষায়ও এ কাব্য রচিত হয়েছিল।

বাংলায় 'গুলে বকাওলী' কাব্যের রচয়িতা হিসেবে নওয়াজিস খান খ্যাতিমান। কবি কাব্যে যে আত্মপরিচয় দান করেছেন তাতে তাঁর বংশলতিকার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এক পূর্বপুরুষ ছিলিম খান গৌড় থেকে চট্টগ্রামে এসে ছিলিমপুর গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কবি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত সুখছড়ি গ্রামে বসবাস করতেন বলে জানা যায়।

আবদুল হাকিম

ক. ইউসুফ-জোলেখা ও খ. লালমতী সয়ফুলমুলুক:

কবি আবদুল হাকিম প্রণয়োপাখ্যান রচনার নিদর্শন রেখেছেন 'ইউসুফ-জোলেখা' ও 'লালমতী সয়ফুলমুলুক' কাব্য রচনা করে। সতের শতকের এই কবি প্রণয়োপাখ্যান ছাড়াও তত্ত্বমূলক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেগুলো হল: নূরনামা, নসিয়তনামা, সভারমূখতা, চারিমোকাভেদ, দোররে মজলিস ইত্যাদি। ফারসি কবি জামীর 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্য অনুবাদ করেছিলেন আবদুল হাকিম। কিন্তু তাঁকে জামীর কাব্যের শ্রেষ্ঠ ও সুষ্ঠু অনুবাদক মনে করা হয় না। তবে তাঁর কাব্যে কবিত্বের নিদর্শন রয়েছে। কবির রচনারীতি ছিল বিবৃতিধর্মী, ভাষা প্রাঞ্জল হলেও ব্যাঞ্জনাময় নয়। আবদুল হাকিমের অপর প্রণয়োপাখ্যান 'লালমতী সয়ফুলমুলুক' কোনো ফারসি উপাখ্যানের অনুসরণে রচিত। আবদুল হাকিমের সময়ে শাস্ত্রকথা বাংলা ভাষায় লেখা দূষণীয় বলে বিবেচিত হত। কবি হয়ত এ কারণে নিন্দিত হয়েছিলেন। তাই বিক্ষুবদ্ধ কবি 'নূরনামা' কাব্যে লিখেছিলেন:

যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥

আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বিকাশ সাধিত হয়। এ সময় বাঙালি কবিরা ধর্মসংস্কারমুক্ত মানবীয় প্রণয়কাহিনি অবলম্বনে নতুন কাব্যধারার প্রবর্তন করেন। বাংলা সাহিত্যে আরাকানকে 'রোসাং' বা 'রোসাঙ্গ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরাকানের বাংলা সাহিত্যে দুটি ধারা লক্ষ্যণীয়। একটি ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কিত এবং অপরটি ধর্মনিরপেক্ষ রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের ধারা। ইসলাম ধর্মের ব্যাপাক সম্প্রসারণ ও উপলব্ধির যথার্থ উপকরণ নিয়ে ধর্মীয় কাব্য রূপ লাভ করেছে। অপরদিকে, প্রণয়কাব্যে আচে অনাবিল মানবিক প্রণয়ের উচ্ছ্বাসপূর্ণ রোমান্টিক গাঁথা ও মর্ম স্পর্শী গীতিসাহিত্য। তবে হিন্দি প্রণয়কাব্যের মধ্যে নিহিত সুফী মতাদর্শের প্রভাবে প্রণয়কাব্যের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ লাভ সম্ভব হয়েছিল।

আরাকান সাহিত্যের কবিগণ

আলাওল

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতানুসারে কবি আলাওলের জন্ম আনুমানিক ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে এবং সম্ভবত তিনি ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে আনুমানিক ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। ড. মুহম্মদ এনামুল হক কবির জীবৎকাল আনুমানিক ১৬০৭ থেকে ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে মনে করেছেন। ড. আহমদ শরীফ আনুমানিক ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে আলাওলের জন্ম সাল ধরেছেন। তাঁর মতে আলাওল ১৬৭৩ থেকে ১৬৮০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে দেহত্যাগ করেন। সৈয়দ আলী আহসানের মতে, কবি আলাওলের জন্ম ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে।

আলাওল 'রচিলু পুস্তক বহু নানা আলাঝালা' বলে অনেক গ্রন্থরচনার ইঙ্গিত দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর বেশি সংখ্যক গ্রন্থ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। আজ পর্যন্ত কবির যেসব রচনার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে সেগুলো হচ্ছে: ১. পদ্মাবতী, ২. সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান, ৩. সতীময়না, ৪. সপ্ত পয়কর, ৫. তোহ্‌ফা, ৬. সেকান্দরনামা, ৭. সঙ্গীতশাস্ত্র (রাগতালনামা) ও ৮. রাধাকৃষ্ণ রূপকে রচিত পদাবলি।

পদ্মাবতী

'পদ্মাবতী' কবি আলাওলের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য। কাব্যটি প্রখ্যাত হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবত' কাব্যের অনুবাদ। অযোধ্যার কবি জায়সী ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে 'পদুমাবত' কাব্য রচনা করেছিলেন। আলাওল ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে আরাকানরাজ সাদ উমাদার বা থদোমিন্তারের আমলে (১৬৪৫-৫২ খ্রি.) মাগন ঠাকুরের আদেশে 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন। 'পদ্মাবতী' হিন্দি পদুমাবতের স্বাধীন অনুবাদ। কাহিনি রূপায়ণ, চরিত্রচিত্রণ, প্রকাশভঙ্গি ইত্যাদি ক্ষেত্রে মধ্যযুগের প্রতিভাশালী কবিগণ যে কৃতিত্ব দেখিয়ে মৌলিক মর্যাদা লাভ করেছেন, সেদিক থেকে আলাওলের স্থান সর্বোচ্চ।

কবি আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে অনেক সুভাষিত উক্তি মেলে। যেমন:

দিবসের মর্ম কভু না বুঝে পেচক।
ললাট লিখন দুঃখ যায় না খণ্ডন।
পড়শী হৈলে শত্রু গৃহে সুখ নাই।

পদ্মাবতীর বিষয়বস্তু

পদ্মাবতী প্রেমমূলক ঐতিহাসিক কাব্য। তবে প্রেমের স্বরূপই এখানে বেশি, ইতিহাস এখানে গৌণ। পদ্মাবতী অপূর্ব সুন্দরী। চিতোরের রাজসভায় রাঘবচেতন নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দিল্লির সম্রাট আলাউদ্দিনের নিকট পদ্মাবতীর অনুপম রূপের প্রশংসা করে তাঁকে হরণ করতে প্ররোচিত করেন। আলাউদ্দিন রত্নসেনের নিকট পদ্মাবতী সম্বন্ধে অনুরূপ প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে চিতোর আক্রমণ করেন। যুদ্ধে রত্নসেন বন্দী হলেও বিশ্বস্ত অনুচরদের সহায়তায় মুক্তি পেতে সক্ষম হন। পরে রাজা দেওপালের সঙ্গে রত্নসেনের যুদ্ধ বাঁধে। সে যুদ্ধে দেওপাল নিহত এবং রত্নসেন আহত হন। এ সুযোগে আলাউদ্দিন পুনরায় চিতোর আক্রমণ করেন। ইতোমধ্যে রত্নসেনের মৃত্যু ঘটলে পদ্মাবতী সহমৃতা হন। আলাউদ্দিন বিজয়ীবেশে চিতোর পৌঁছে তাঁদের জ্বলন্তচিতা দেখতে পেলেন। তখন চিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সুলতান দিল্লি ফিরে এলেন।

সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল

আলাওলের দ্বিতীয় কাব্য সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল। আরাকানরাজের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের উৎসাহে কবি ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে এ কাব্য রচনা আরম্ভ করেন।

সতীময়না লোরচন্দ্রানী

দৌলত কাজী রচিত 'সতীময়না লোরচন্দ্রানী' কাব্যের অবশিষ্টাংশ আলাওলের তৃতীয় রচনা। দৌলত কাজীর এ অসমাপ্ত গ্রন্থটি আলাওল আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্রসুধর্মার অমাত্য সোলেমানের উৎসাহে ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত করেন।

সপ্তপয়কর

আলাওলের চতুর্থ রচনা 'সপ্তপয়কর'। কাব্যটি পারস্য কবি নিজামী গঞ্জভী'র 'হপ্তপয়কর' নামক কাব্যের অনুবাদ। তবে তা আলাওলের অন্যান্য কাব্যের মতোই ভাবানুবাদ। আরাকানরাজের সমরমন্ত্রী সৈয়দ মুহম্মদের আদেশে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে কবি এ কাব্য রচনা করেন।

তোহফা

'তোহফা' গ্রন্থটি কবি আলাওলের পঞ্চম রচনা। এই কাব্য বিখ্যাত সুফী সাধক শেখ ইউসুফ গদা দেহলভীর 'তোহ্ফাতুন নেসায়েহ' নামক ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ। আলাওল ১৬৬৪ সালে এ কাব্য সমাপ্ত করেন।

সেকান্দরনামা

আলাওলের ষষ্ঠ গ্রন্থ 'সেকান্দরনামা'। কাব্যটি নিজামী গঞ্জভীর ফারসি 'সেকান্দরনামা' গ্রন্থের অনুবাদ। নবরাজ উপাধিধারী মজলিস নামক আরাকানরাজ চন্দ্র সুধর্মার জনৈক অমাত্যের অভিপ্রায়ে গ্রন্থটি রচিত।

দৌলত কাজী

দৌলত কাজী চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির আদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক আরাকানরাজের প্রধান অমাত্য ও লস্কর উজির আশরাফ খানের নিবাসও ছিল রাউজানের অদূরবর্তী গ্রাম চারিয়ায়। মধ্যযুগের কবিগণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাঁর কাব্যে কবির পৃষ্ঠপোষক সম্পর্কে বিবরণ থাকলেও নিজের পরিচয় সম্পর্কে তেমন কিছুই বলেননি। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতানুসারে কবির জীবনকাল আনুমানিক ১৬০০ থেকে ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য যখন দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনে মুখরিত হয়েছিল তখন বাংলাদেশের বাইরে আরাকানের বৌদ্ধরাজদের সভায় বাংলা সাহিত্যচর্চার নিদর্শন হিসেবে কবি দৌলত কাজী 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রনী' কাব্য রচনা করে মানবীয় আখ্যায়িকার ধারা প্রবর্তন করেন। এতদিন পর্যন্ত বাংলা কাব্যে দেবদেবীর প্রশংসাই উপজীব্য ছিল, মানুষের কাহিনি অবলম্বনে কাব্য রচনার কোনো প্রয়াসই তখন পরিলক্ষিত হয়নি। মধ্যযুগে ধর্ম সংস্কারমুক্ত ঐহিক কাব্যকথার প্রবর্তন করেন মুসলমান কবিগণ এবং তা আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করেই রূপায়িত হয়ে ওঠে। একান্তমানবিক প্রেমাবেদন-ঘনিষ্ঠ এসব কাব্য অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ সময়ের কবিগণের পুরোধা দৌলত কাজী বাংলা রোমান্টিক কাব্যধারার পথিকৃৎ হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আরাকানের তৎকালীন অধিপতি থিরি থু ধম্মা বা শ্রীসুধর্মার (রাজত্বকাল ১৬২২-১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ) 'লস্কর উজির' বা সমর-সচিব আশরাফ খানের অনুরোধে দৌলত কাজী 'সতীময়না লোরচন্দ্রানী' কাব্য রচনা করেন। সংক্ষেপে কাব্যটি সতীময়না অথবা লোরচন্দ্রানী নামে পরিচিত। এ কাব্যের সঠিক রচনাকাল জানা যায়নি; অনুমান করা হয় ১৬৩৫ থেকে ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এ কাব্য রচিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত কাব্যটি সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই কবি মৃত্যুমুখে পতিত হন। কবির মৃত্যুর বিশ বৎসর পরে ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে কবি আলাওল কাব্যের শেষাংশ রচনা করে তা সম্পূর্ণ করেন।

'সতীময়না' লোরচন্দ্রানী কাব্যের কাহিনি খুবই প্রাচীনকাল থেকে লোকগাথা হিসেবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত ছিল। এই লোকগাথা অবলম্বন করে হিন্দি কবি সাধন 'মৈনাসত' নামে একটি কাব্য লেখেন। দৌলত কাজী তা অবলম্বন করে 'সতীময়না লোরচন্দ্রানী' কাব্য রচনা করেন।

কোরেশী মাগন ঠাকুর

আরাকান রাজসভার অন্যতম খ্যাতিমান ব্যক্তি হিসেবে কোরেশী মাগন ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য। কবি কোরেশ বংশজাত সিদ্দিকী গোত্রভুক্ত মুসলমান। তাঁর প্রকৃত নামদ জানা যায়নি। মাগন ঠাকুর তাঁর ডাকনাম। 'ঠাকুর' আরাকানি রাজাদের সম্মানিত উপাধি। কবির প্রপিতামহ ছিলেন আরব থেকে আগত কোরেশ। মাগন ঠাকুরের জন্ম চট্টগ্রামের চক্রশালা বা চাশখালায়। পরে রোসাঙ্গবাসী হন। তিনি 'চন্দ্রাবতী' নামক কাব্যের রচয়িতা এবং কবি আলাওলের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ড. মুহম্মদ এনামুল হক কবির কাল আনুমানিক ১৬০০ থেকে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ বলে নির্দেশ করেছেন। 'চন্দ্রাবতী' কাব্যটির প্রথম ও শেষাংশ খণ্ডিত বলে কবির নিজের পরিচয় তেমন নেই। কবি আলাওল মাগন ঠাকুরের উৎসাহে 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্য রচনা করেন। সেখানে মাগন ঠাকুরের কিছুটা পরিচয় দেওয়া হয়েছে। মাগন ঠাকুর রোসাঙ্গরাজের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সেখানেই তিনি বসবাস করতেন এবং সেখানেই তিনি মারা যান। মাগন ঠাকুর গুণশালী ও বহু শাস্ত্রবিদ কবি ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেও তাঁর পক্ষে কাব্যরচনা করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি আরবি, ফারসি, বর্মি ও সংস্কৃত ভাষা জানতেন। কাব্য, নাটক ও সঙ্গীতে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল।

বিগত BCS প্রশ্নাবলী

০১) 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' কাব্যের মূল রচয়িতাদের নাম কী? কোন ভাষায় লেখা? (১৭তম BCS)

০২) কৃত্তিবাস কোন কাব্যের জন্য বিখ্যাত? তিনি কোন সময়ে ঐ কাব্যটি রচনা করেন? (১৫তম BCS)

০৩) প্রথম কোন মহিলা কবি রামায়ণ রচনা করেন? (১১তম BCS)

আলোচ্য বিষয়

মধ্যযুগ: অনুবাদ সাহিত্য: গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১) 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' কাব্যের মূল রচয়িতাদের নাম কী?

০২) হিন্দি ভাষা থেকে অনূদিত তিনটি কাব্যের নাম ও অনুবাদকের নাম লিখুন।

STUDENT STUDY মধ্যযুগ: অনুবাদ সাহিত্য

অনূদিত গ্রন্থের তালিকা

ড. ওয়াকিল আহমদ সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ও হিন্দি উৎস থেকে বাংলায় অনূদিত গ্রন্থের একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তালিকাটি নিম্নরূপ:

ভাষা	অনুবাদ গ্রন্থ	লেখক	মূল গ্রন্থ/উৎস
সংস্কৃত	রামায়ণ	কৃত্তিবাস	রামায়ণ (বাল্মীকিকৃত)
	মহাভারত	কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, কাশীরাম দাস	মহাভারত (ব্যাসকৃত)
	ভাগবত	মালাধর বসু	ভাগবত পুরাণ (ব্যাসদেব কৃত)
প্রেমাখ্যান	বিদ্যাসুন্দর	দ্বিজ শ্রীধর, সাবিরিদ খান	বিদ্যাসুন্দরম (বররুচিকৃত)
আরবি	ইবীবংশ	সৈয়দ সুলতান	কিসাসুল আমবিয়া (স'লাবা বিরচিত)
ফারসি	ইউসুফ-জোলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর, আবদুল হাকিম, ফকির গরীবুল্লাহ।	ইউসুফ ওয়া জুলায়খা (জামীকৃত)
	লায়লী-মজনু	দৌলত উজীর বাহরাম খান, মুহম্মদ খাতের।	লায়লা ওয়া মজনুন (নিজামীকৃত)
	হানিফা ও কয়রাপরী	সাবিরিদ খান	(অজ্ঞাত)
	সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল	দোনা গাজী চৌধুরী, আলাওল, ইব্রাহিম।	আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা
	সপ্ত পয়কর	আলাওল	হফত পয়কর (নিজামীকৃত)
	সিকান্দরনামা	আলাওল	সিকান্দরনামা (ঐ)
	গুলেবকাওলী	নওয়াজিস খান, মুহম্মদ মুকীম	তাজুলমূলক্ গুল-ই বকা গুলী (ইজ্জতুল্লাহকৃত)
ধর্মীয় গ্রন্থ	ইসিহৎনামা	আবদুল হাকিম	(অজ্ঞাত)
	নূরনামা	আবদুল হাকিম	(ঐ)
	তোহফা	আলাওল	তোহফাতুন নেসায়েহ (ইউসুফ গদাকৃত)
	হাতেম তাই	সৈয়দ হামজা	আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা
	আমীর হামজা	সৈয়দ হামজা	কিস্সা-ই-আমীর হামজা (মোল্লা জালাল বালখি কৃত)
হিন্দি	সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী	দৌলত কাজী (আলাওল)	মৈনাসত (সাধনকৃত)
	পদ্মাবতী	আলাওল	পদুমাবৎ (মালিক মুহম্মদ জায়সীকৃত)
	মধুমালতী	মুহম্মদ কবীর, সৈয়দ হামজা	মধুমালত (মনঝনকৃত)

রামায়ণ

বাল্মীকি রচিত রামায়ণ আদি মহাকাব্য। আবার শিল্পসম্মত ও আলঙ্করিক কাব্যকৃতি রূপে রামায়ণই প্রথম কাব্য। এটি সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত– বাল, অযোধ্যা, আরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তর কাণ্ড। সময়ে সময়ে বিভিন্ন অনুবাদকগণ এটি অনুবাদ করেন–

ক) কৃত্তিবাসের রামায়ণ: কৃত্তিবাস বাংলা ভাষায় ১ম রামায়ণ অনুবাদ করেন। তাই বাল্মীকি যেমন সংস্কৃতের 'আদিকবি' কৃত্তিবাসও তেমনি বাংলার 'আদিকবি'। মধুসূদন দত্ত তাই যথার্থই বলেছিলেন– 'কৃত্তিবাস কীর্তিবাস তুমি'।

খ) অদ্ভুত আশ্চর্য রামায়ণ কথা: নিত্যানন্দ আচার্য অদ্ভুতাচার্য নাম ধারণ করে রামায়ণ অনুবাদ করে।

গ) চন্দ্রাবতীর রামায়ণ: একমাত্র মহিলা কবি হিসেবে রামায়ণ অনুবাদ করেন চন্দ্রাবতী। তিনি 'মনসামঙ্গল' রচয়িতা কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা।

মহাভারত

পাণ্ডবদের কীর্তিকথা, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে কৌরবদের বিনাশ এবং পরিণামে পাণ্ডবদের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব মহাভারত মহাকাব্য রচনা করেন। নিম্নে মহাভারতের বিভিন্ন অনুবাদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল–

ক) কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও পরাগলী মহাভারত: বাংলা ভাষায় মহাভারত কাব্যের প্রথম অনুবাদক কবি ছিলেন 'পরাগলী মহাভারতের' লেখক কবীন্দ্র পরমেশ্বর। গৌড়েশ্বর সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সেনাপতি লস্কর খানের উৎসাহে তিনি এটি রচনা করেন।

খ) শ্রীকরনন্দী ও ছুটিখানী মহাভারত: পরাগল খানের পুত্র ছুটিখানের আদেশে জৈমিনি মহাভারতের 'অশ্বমেধ পর্বের' অংশ নিয়ে শ্রীকরনন্দী 'ছুটিখানি মহাভারত' নামে মহাভারত অনুবাদ করেন।

গ) কাশীরাম দাসের মহাভারত: কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সংস্কৃত মহাভারতের অনুসরণে 'মহাভারত' রচনা করেন কাশীরাম দাস।

ভাগবত

পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আদর্শকে সূত্রাবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথার বর্ণনাভঙ্গিমায় রচিত 'শ্রীমদ্ভাগতব'। এতে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণলীলা বা শ্রীকৃষ্ণ জীবন বিবৃত করা হয়েছে। মালাধর বসু ভাগবতের ১ম বাংলা অনুবাদক। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে ভাগবতের অনুবাদ প্রকাশ করেন।

কোরআন শরীফ

বাংলায় কোরআন শরীফের প্রথম অনুবাদক হলেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। তিনি ১৮৮৬ সালে কোরআন শরীফ অনুবাদ করেন। গিরিশচন্দ্র সেনের উপাধি হল 'ভাই'। তার বাড়ি ছিল নরসিংদী জেলায়।

বিগত BCS প্রশ্নাবলী

০১) চন্দ্রকুমার দে এবং দীনেশচন্দ্র সেনের নাম কেন লোকসাহিত্য প্রেমীর হৃদয়ে চিরদিন জেগে থাকবে? (৩৮তম BCS
০২) লোকসাহিত্য বলতে কি বোঝেন? এর প্রধান শাখা কি কি? (৩২তম BCS)
০৩) 'ময়মনসিংহ গীতিকা' কী? এর অন্তত দুটি পালার নাম লিখুন। (২০তম BCS)
০৪) কবিগান বলতে কী বোঝায়? চারটি বাক্যে উত্তর দিন। (১৮তম BCS)
০৫) মনসুর বয়াতী কে? তার কাব্যের নাম কি? (১৭তম BCS)
০৬) লালন শাহ কী রচনা করেন? (১০তম BCS)

আলোচ্য বিষয়

মধ্যযুগ: লোকসাহিত্য: গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১. লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
০২. 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র তিনটি পালা এবং পালাকারের নাম লিখুন।
০৩. 'ময়মনসিংহ গীতিকা'য় নারীচরিত্র কীভাবে রূপায়িত হয়েছে?

STUDENT STUDY মধ্যযুগ: লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্য বলতে জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গাথা কাহিনি, গান, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদি বোঝানো হয়। সাধারণত কোন সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠির অলিখিত সাহিত্যই লোকসাহিত্য। অর্থাৎ জাতীয় সংস্কৃতির যে সকল সাহিত্য গুণসম্পন্ন সৃষ্টি প্রধানত মৌখিক ধারা অনুসরণ করে অগ্রসর হয় তাকে লোকসাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সাহিত্য সৃষ্টি করার যে প্রবণতা চিরন্তনভাবে মানবমনে বিদ্যমান থাকে তা-ই লোকসাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। এ ধরণের সাহিত্যের সৃষ্টি হয় মানুষের মুখে মুখে এবং পরে তা মুখে মুখেই প্রচলিত থাকে। লোকসাহিত্যের শাখা-প্রশাখা সমূহ হল– ছড়া, গান, গীতিকা, কথা, ধাঁধাঁ, প্রবাদ ইত্যাদি।

লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

লোকসাহিত্য সাধারণত কোন ব্যক্তিবিশেষের একক সৃষ্টি নয়, তা সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। সংহত সমাজ বলতে সে সমাজকে বোঝায় যার অন্তর্ভুক্ত মানবগোষ্ঠী পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিতর দিয়ে চিরাচরিত প্রথার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে চলে। লোকসাহিত্যের সমাজ বিচিত্র সাংস্কৃতিক উপকরণের সমৃদ্ধ হয়ে সাহিত্যসৃষ্টির সহায়ক হয়। সমষ্টির সৃষ্টি বলে লোকসাহিত্য কোন ব্যক্তিবিশেষের নামের সঙ্গে জড়িত থাকে না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের বিক্ষিপ্ত রচনা কালক্রমে একত্রিত হয়ে একটা বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ পরিগ্রহ করে। সমাজবদ্ধ জীবনে মানুষের ব্যক্তি পরিচয় বড় হয়ে ওঠে না বলে লোকসাহিত্য রচয়িতা হিসেবে কোন বিশেষ কবি বা গীতিরচয়িতাকে বিবেচনা না করে সমাজকেই রচয়িতা মনে করতে হয়। প্রথমত তা ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি থাকলেও জনগণের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে তা নতুন রূপ পরিগ্রহ করে এবং পরিণামে সামগ্রিক সৃষ্টি হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে।

লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু

লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু সমাজের পরিবেশ থেকে গৃহীত হয়। জনশ্রুতিমূলক বিষয় এর উপাদান। বহুদিন পূর্বের কোন ঘটনা বা কাহিনি লোকপরম্পরায় কল্পনারূপক মিশ্রিত হয়ে লোকসাহিত্যে স্থান পায়। সাধারণত সমসাময়িক জীবন তাতে তেমন প্রতিফলিত হয় না। চিরন্তর বিষয়বস্তুই সাহিত্যের উপজীব্য হয় বলে লোকসাহিত্যেও এর নিদর্শন বিদ্যমান। বহুকাল পূর্বের মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার রসমণ্ডিত পরিচয় লোকসাহিত্যে বিধৃত। অতীতের ইতিহাস ও সমাজচিত্র এই সাহিত্যে রূপায়িত হয়ে ওঠে। মানব জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা কোন কাহিনি, গান, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদি আশ্রয় করে মৌলিক আকৃতি ও পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে লোকসাহিত্যের অন্তর্গত হয়ে থাকে। লোকসাহিত প্রাচীন জনশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে উদ্ভাবিত হলেও এতে আধুনিক চিন্তাধারার সংযোগ ঘটে। তাই লোকসাহিত্য প্রাচীন হয়েও নতুন, প্রাচীনের সঙ্গে নতুনের যোগসেতু রচনা করতে লোকসাহিত্যই একমাত্র উপায়। এর মধ্যে প্রাণশক্তি আছে বলেই তা অতীতের ভিতর দিয়ে এসে বর্তমানে পৌঁছেছে।

বাংলা সাহিত্যে লোকসাহিত্যের প্রভাব

মধ্যযুগের লৌকিক কাহিনি কাব্যে, প্রণয়োপাখ্যানে, অনুবাদ সাহিত্যে লোক সাহিত্যের উপাদান রয়েছে। এ সকল সাহিত্যের কবিগণ লোকজীবন থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে তাদের ধার করা কাহিনির সঙ্গে তা সংযুক্ত করতেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মীয় পরিমণ্ডলের বাইরে লোকসাহিত্য মানবিক গুণ সমৃদ্ধ এক অনন্য সৃষ্টি। দীর্ঘদিন ধরে এর উদ্ভব ও প্রচলন থাকায় তৎকালীন ও পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকগণ এ থেকে সাহিত্য উপকরণ সংগ্রহ করেছেন।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, 'লোকসাহিত্যের মৌখিক ধারার উপর ভিত্তি করিয়াই মঙ্গলকাব্যের লিখিত ধারার সৃষ্টি হয়েছে।' যে জন্য মঙ্গলকাব্যগুলোতে দেবদেবীর জন্মবৃত্তান্তলোক সাহিত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অনুবাদ সাহিত্যের ওপরও লোকসাহিত্যের প্রভাব আছে। মধ্যযুগের অনুবাদক কবিরা প্রাচীন মহাকাব্য ও পুরাণের আক্ষরিক অনুবাদের দিকে মনোযোগী ছিলেন না, তারা ভাবানুবাদ করতে গিয়ে লোকসাহিত্যের উপকরণ কাব্যে স্থান দিয়েছেন।

বাংলা রোমান্টিক প্রণয়কাব্যগুলো সংস্কৃত হিন্দি ফারসি কাব্য হতে অনূদিত হলে কবিরা ভাবানুবাদের সময় এ সকল সাহিত্যে লোকসাহিত্যের উপকরণ ব্যবহার করেছেন।

ছড়া

লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি– ছড়া। ছড়াগুলো বিশেষ কোন ব্যক্তির সৃষ্টি বলে মনে করা যায় না, এর সৃষ্টির পিছনে সমষ্টিমনের প্রভাব কার্যকর। ভাবের দিক থেকে তেমন কোন পরিণতি ছড়ায় থাকে না, ভাবের অস্পষ্ট আভাস ও দুর্লক্ষ্য ইঙ্গিত তাতে বিদ্যমান। ছড়াগুলোতে রসের প্রাধান্য পায়, ছন্দঝঙ্কারে মন বিমুগ্ধ হয় বুদ্ধি দিয়ে তাকে বিচার করার প্রয়োজন পড়ে না। সুনির্দিষ্ট কোন রচনাকাল নেই এবং রচয়িতারও কোন পরিচয় মিলে না। চিরপুরাতন হয়েও ছড়াগুলো চিরনতুনের মর্যাদা পায়। ছড়া পরিবর্তনশীল, এরা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত নয়– নিছক আনন্দ সঞ্চারের দিকেই ছড়ার লক্ষ্য। লঘুভার, অর্থহীন, সংক্ষিপ্ত ও বিচিত্র বলে ছড়া সহজেই শিশুমনকে আকৃষ্ট করে।

ছড়ার ছন্দ প্রকৃতিঃ ছড়ার ছন্দ বাংলা কবিতার প্রাচীনতম ছন্দ। ছড়ার ছন্দ স্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ। পর্বের আদি স্বরে শ্বাসাঘাত পড়ে বলে এই নাম দেওয়া হয়েছে। একে লৌকিক ছন্দও বলা হয়। আধুনিক কালে এই ছন্দ ছড়ার বিষয়বস্তুর পরিধি ছাড়িয়ে নানা বিষয়ের বাহন হয়ে উঠেছে।

লোকগীতি

বাংলা লোকসাহিত্যে গান বা গীতি বিস্তৃত অংশ জুড়ে আছে এবং এর বৈচিত্র্যও অত্যধিক। লোকগীতি এক একটি বিষয় অবলম্বনে গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে কোন অজানা লোক কবি কর্তৃক রচিত এবং তা লোকসমাজে মুখে মুখে গীত হয়ে চলে এসেছে। জনপ্রিয়তার দিক থেকে লোকগীতি অপরাপর লোকসাহিত্যের নিদর্শনের চেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠিত।

লোকগীতিতে কোনো কাহিনি থাকে না। বিশেষ বিশেষভাবে অবলম্বনে এই শ্রেণির গান রচিত। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এগুলো অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। জীবনের এমন কোন বিষয় নেই যা গীতির অন্তর্ভুক্ত হয়নি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানব জীবনের প্রতিটি অবস্থাই লোকগীতির মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে। গান গাওয়ার প্রণালী বিচার করে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকগীতিকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করেছেনঃ ক) যে গীতির তাল আছে এবং যা কোন ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত তাকে সক্রিয় সঙ্গীত, খ) যে গীতির তাল নেই এবং যা অলস অবসরে গীত হয় তাকে ভাটিয়ালি বলা যায়। কিন্তু বিষয় ও বিস্তারের দিক থেকে লোকগীতি আরও বৈচিত্র্যধর্মী।

ড. আশরাফ সিদ্দিকী লোকগীতিকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিভক্ত করেছেন: ১) আঞ্চলিক গীতি– যা অঞ্চলবিশেষে বিশেষভাবে প্রচলিত, ২) ব্যবহারিক– বিবাহ উৎসব ইত্যাদি উপলক্ষে যা গীত হয়, ৩) হাসির গান– হাসির বিষয় নিয়ে গীত হয়, ৪) কর্মসঙ্গীত এবং শ্রমসঙ্গীত– যা নানা কাজ অর্থাৎ কৃষিকর্ম, নৌকাবাইচ, ছাদ পিটানো ইত্যাদিতে গাওয়া হয়, ৫) প্রেমসঙ্গীত– বিরহিণী নারী ও বিরহী পুরুষের নানা হৃদয়বেদনা ও চিরন্তন প্রেম সম্ভাষণ যাতে প্রকাশিত হয়, ৬) বারমাসী– অপেক্ষাকৃত লম্বা গানে বিরহিণী নারীর বার মাসের বিরহবেদনা যেসব গানে প্রকাশিত হয়।

সিরাজউদ্দিন কাশিপুরী 'বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি' গ্রন্থে লোকসঙ্গীতকে ক) সাধারণ ও খ) তত্ত্বসঙ্গীত– এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। সাধারণ সঙ্গীতের অন্তর্গত প্রেমসঙ্গীত, ঘাটু গান, ঢপযাত্রা, উরি বা হোলিগান, ভাওয়াইয়া গান, ভাটিয়ালি, কৃষ্ণলীলা, ঝুমুর, বারমাসী, পালাগান, জারি-সারি, গাজীর গীত, কর্মসঙ্গীত, সন্ন্যাস ও শোকসঙ্গীত, গম্ভীরা, জাগগান, ধুয়াগান, মেয়েলি গীত, পটুয়া গীত, কবিগান, সাপুড়ে গান, ব্রত বা পূজাপার্বণের গান, গোষ্ঠযাত্রা, রঙ্গরসের গান ইত্যাদি। তত্ত্বসঙ্গীতের মধ্যে বাউল-মুর্শিদা-মারফতি গানই প্রধান।

ফারসি ballet বা নৃত্য শব্দ থেকে এসেছে ballad শব্দটি। Ballad বলতে আখ্যানমূলক লোক সঙ্গীতকে বোঝায়। ইংরেজি সাহিত্যের ballad বাংলা সাহিত্যে গীতিকা নামে অভিহিত। মূলত: এক শ্রেণির আখ্যানমূলক লোকগীতি হল গীতিকা, গীতিকার কাহিনি হয় দৃঢ়-সংবদ্ধ। একটি মাত্র পরিণতি লক্ষ্য করে গীতিসংলাপ ও ঘটনাপ্রবাহ কাহিনিকে দ্রুত অগ্রসর করিয়ে নেয়। এটি কাহিনি প্রধান গতিশীল রচনা এবং গুণ সম্পন্ন। সুর সহযোগে গীত হলেও গীতিকার কথাই মূখ্য, সুর গৌণমাত্র।

প্রকারভেদ

↘ বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত লোকগীতিকাগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে:

১) নাথগীতিকা,

২) মৈমনসিংহ গীতিকা ও

৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

নাথগীতিকা

স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে রংপুর জেলার মুসলমান কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে 'মাণিচন্দ্র রাজার গান' প্রকাশ করলে 'নাথগীতিকা' সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইগুলো এক শ্রেণির ঐতিহাসিক রচনা। ইতিহাসের কোন বিস্মৃত যুগে এই গীতিকার নায়ক রাজা গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র মায়ের নির্দেশে তরুণ যৌবনে দুই নবপরিণীতা বধূ প্রাসাদে রেখে সন্ন্যাস অবলম্বন করেছিলেন– এই কাহিনিকে কেন্দ্র করেই নাথগীতিকার উদ্ভব। নাথসম্প্রদায়ভুক্ত গুরুবাদী যোগিগণ তাঁদের গুরুর অলৌকিক মহিমাকীর্তন প্রসঙ্গে এই গীতিকা দেশবিদেশে প্রচার করেছেন। নাথগীতিকার দুটি বিভাগ: প্রথমটি তরুণ রাজপুত্র গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের কাহিনি। এ সম্পর্কিত 'গোরক্ষবিজয়', 'মীনচেতন' নামে পরিচিত। অপর শ্রেণির গীতিকাগুলো 'মাণিক রাজার গান', গোবিন্দ্রচন্দ্রের গীত', 'ময়নামতীর গান', গোবিন্দচন্দ্রের গান', 'গোপীচাঁদের পাঁচালী' ইত্যাদি নামে খ্যাত।

মৈমনসিংহ গীতিকা

ড. দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যেসব গীতিকা সংগৃহীত হয়েছিল তা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা বিভক্ত সাবেক বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশে নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জের বিল, হাওর ও বিভিন্ন নদনদীপ্লাবিত বিস্তৃত ভাটি অঞ্চলে বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকার যে শতদলগুলো বিকশিত হয়েছিল তা-ই 'মৈমনসিংহ গীতিক' নামে দেশবিদেশের মনীষীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পূর্ব ময়মনসিংহের সাধারণ জনসমাজ কোচ, গারো, হাজং, রাজবংশী প্রভৃতি মাতৃতান্ত্রিক উপজাতি দ্বারা গঠিত। এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য ময়মনসিংহ গীতিকায় প্রতিফলিত। এই সমাজে নারীর স্বাধীন প্রেমের যে স্বীকৃতি রয়েছে তার অনুসরণে গীতিকাগুলো নারী চরিত্রের রূপায়ণ লক্ষ করা যায়।

বিষয়বস্তু

ময়মনসিংহ গীতিকার কাহিনিগুলো প্রেমমূলক এবং তাতে নারীচরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। নারীর ব্যক্তিত্ব, আত্মবোধ, স্বাতন্ত্র্য, সতীত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য এই সব গীতিকার প্রকাশমনা। এখানকার নায়িকারা অপূর্ব প্রেমশক্তির অধিকারিণী হয়ে তাদের নারীধর্ম সতীধর্ম রক্ষা করেছে। প্রেমের জন্য দুঃ, তিতিক্ষা, আত্মত্যাগ, সর্বসমর্পণ করে নারী যে কি অসীম মহিমা লাভ করতে পারে, গীতিকাগুলো তারই পরিচায়ক। পল্লীকবির সহজ সরল দৃষ্টিতে শ্বাশ্বত নারীর অকৃত্রিম রূপ এখানে ফুটে উঠেছে। চরিত্রগুলো যেন সে অঞ্চলের নদনদী-হাওর-অরণ্য বিধৃত প্রাকৃতিক সত্তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাদের মাধুর্য ও সৌন্দর্যের সঙ্গে সর্বসংস্কারমুক্ত প্রেমের বিকাশ ঘটেছে।

পূর্ববঙ্গ গীতিকা

পূর্ববঙ্গ গীতিকা নামে পরিচিত গীতিকাগুলোর কিছু পূর্ব ময়মনসিংহ থেকে এবং অবশিষ্ট গীতিকা নোয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। শেষোক্ত শ্রেণির গীতিকার ময়মনসিংহের নিভৃত পল্লীর নিবিড় সমাজজীবন অনুপস্থিত। বরং সে অঞ্চলের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে গীতিকাগুলোর মধ্যে দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ কাহিনি স্থান পেয়েছে। 'নিজাম ডাকাতের পালা, 'কাফ চোরা'; 'চৌধুরীর লড়াই', 'ভেলুয়া', নুরুন্নেহা ও কবরের কথা'; 'কমল সদাগর'; সুজা তনয়ার বিলাপ'; 'পরীবানুর হাঁহলা' ইত্যাদির উল্লেখযোগ্য। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই যথার্থ গীতিকার মর্যাদা পেতে পারে না, নিছক বর্ণনা হিসেবে বিবেচ্য।

আদিম সমাজের উপকরণের সঙ্গে বিভিন্ন সমাজের মিশ্র উপাদানের সংমিশ্রণে ময়মনসিংহ গীতিকার সমাজ গঠিত। পল্লীকবিরা তাঁদের নিজেদের পারিপার্শ্বিক সমাজ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। পল্লীসমাজের সহজ প্রেম গীতিকাগুলোর উপজীব্য হয়ে তৎকালীন সমাজকে প্রতিফলিত করেছে। রাষ্ট্রীয় কলকোলাহলের বাইরে সাধারণ সমাজের আনন্দবেদনার প্রতিচ্ছবি এই গীতিকাগুলো। ময়মনসিংহ গীতিকায় সাধারণ সমাজ যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা বাংলা কাব্যের সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে ইতোপূর্বে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে নি। তাই প্রথম সামাজিক কবিতা হিসেবে এগুলোর বিশেষ মূল্য আছে।

ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত পূর্ব-ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত গীতিকাগুলো হচ্ছে: মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা ও দেওয়ানা মদিনা।

মহুয়া

গীতিকাগুলোর মধ্যে মহুয়া পালাটিতে ময়মনসিংহ গীতিকার বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। বেদের এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে মহুয়ার সঙ্গে বামনকান্দার জমিদার ব্রাহ্মণ যুবক নদের চাঁদের দুর্জয় প্রণয়কাহিনি অবলম্বনে পালাটি রচিত। পল্লীকবি আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে এই বিষাদাত্মক প্রেমকাহিনি বর্ণনা করেছেন। মানবচরিত্র সম্পর্কে কবির সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রেমের বিচিত্র বিকাশের সহায়ক ছিল। নায়ক-নায়িকার প্রেমানুভূতি কবি নাটকীয় গুণে সমৃদ্ধ করে বর্ণনা করেছেন।

দেওয়ানা মদিনা

মনসুর বয়াতি রচিত 'দেওয়ান মদিনা' পালাটি ময়মনসিংহ গীতিকা সংগ্রহের অন্যতম শ্রেষ্ঠগীতিকা হিসেবে সমাদৃত। বানিয়াচঙ্গের দেওয়ান সোনাফরের পুত্র আলাল ও দুলালের বিচিত্র জীবনকাহিনি এবং দুলাল ও গৃহস্থকন্যা মদিনার প্রেমকাহিনি এই পালার বিষয়বস্তু। দেওয়ান হওয়ার প্রলোভনে দুলাল নিরপরাধিনী পল্লীবালা মদিনাকে ত্যাগ করায় তার জীবনে যে করুণ মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছিল কবি অপরিসীম সহানুভূতির সঙ্গে তা বর্ণনা করেছেন। নীরব সহিষ্ণুতার মাধ্যমে নারীজীবনের যে মাধুর্য প্রকাশ পেতে পারে কবি তা বাস্তব ও জীবন্তকরে রূপ দিয়েছেন। গৃহস্থকন্যা মদিনার অনাবিল প্রেমের দুর্বার আকর্ষণ ঐশ্বর্য ও আভিজাত্যবোধের মোহ থেকে দেওয়ান দুলালকে পরিত্যাক্ত পল্লীর জীর্ণকুটিরে নিয়ে অবশিষ্ট জীবন প্রায়শ্চিত্তে কাটানোর সুযোগ দান করেছিল।

লোককথা

গদ্যের মাধ্যমে বর্ণিত কাহিনিকে লোককথা বা লোককাহিনি (folk-lore) বলে। লোককথার উপকরণ এসেছে মানুষের শ্রুতি পরম্পরায় আগত বিষয়বস্তু থেকে। আধুনিক যুগের গল্প বা উপন্যাস থেকে লোককথার পার্থক্য এই যে, উপন্যাস সৃষ্টি হয় লেখকের নিজস্ব মৌলিক কল্পনার ফসল হিসেবে, আর লোক কথা মৌখিক বা জনশ্রুতি মূলক ধারা অনুসরণ করে।

প্রকারভেদ

ক) **রূপকথা:** রূপকথার মাধ্যমে এক অজানা রহস্যময় জগতের বিচিত্র কাহিনি শ্রোতার কাছে পরিবেশিত হয়, ভৌগোলিক মাপকাঠিতে সে সব রাজ্যের কোন পরিচয় থাকে না। নানা অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য ঘটনা এতে ভীড় করে। বাস্তব রাজ্যের সঙ্গে রূপকথার কোন সম্পর্ক নেই। বিশেষ কোন দেশ বা কালের সমাজ, ধর্ম, নীতি, সৌন্দর্যবোধ আশ্রয় না করে তা একটি নির্বিশেষে রসরূপ লাভ করে। রূপকথায় বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য সহজেই লক্ষণীয়।

খ) **উপকথা:** পশপক্ষীর চরিত্র অবলম্বনে যেসব কাহিনি গড়ে উঠেছে সেগুলোর নাম উপকথা। কৌতুকসৃষ্টি ও নীতিপ্রচারের জন্যই এগুলোর সৃষ্টি। এতে মানবচরিত্রের মতই পশুপাকির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে।

গ) **ব্রতকথা:** বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েলি ব্রতের সঙ্গে সম্পর্কিত কাহিনি অবলম্বনে ব্রতকথা নামে এক ধরনের লোককথার বিকাশ ঘটেছে। এ সব কাহিনিতে যে ধর্মবোধের কথা বলা হয়েছে তাতে মেয়েদের জাগতিক কল্যাণই নিহিত। ব্রতকথার কাজ গার্হস্থ্য কর্তব্য সাধন। গার্হস্থ্য সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা মিটানো এর লক্ষ্য।

বিগত BCS প্রশ্নাবলী

০১. দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের কয়েকজন রচয়িতার নাম লিখুন।

আলোচ্য বিষয়

মধ্যযুগ: দোভাষী পুঁথি সাহিত্য, মর্সিয়া সাহিত্য, কবিগান: গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১. দোভাষী পুঁথি সাহিত্য বলতে কী বোঝেন?
০২. দুইটি দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের দৃষ্টান্ত দিন।
০৩. মর্সিয়া সাহিত্য কি?
০৪. মর্সিয়া সাহিত্যের তিনজন কবির নাম লিখুন।
০৫. একজন কবিওয়ালার পরিচয় দিন।
০৬. গোঁজলা গুঁই/হরু ঠাকুর/ভোলা ময়রা/এন্টনি ফিরিঙ্গি/নিধু বাবু কে ছিলেন?

STUDENT STUDY | মধ্যযুগ: দোভাষী পুঁথি সাহিত্য, মর্সিয়া সাহিত্য, কবিগান

পুঁথিসাহিত্য

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরবি-ফারসি শব্দমিশ্রিত এক ধরনের বিশেষ ভাষারীতিতে যেসব কাব্য রচিত হয়েছিল তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পুঁথি সাহিত্য/দোভাষী সাহিত্য নামে চিহ্নিত। প্রণয়-উপাখ্যান, ইতিহাসাশ্রিত কাল্পনিক কাহিনি ইত্যাদি এই ধরনের কাব্যের উপজীব্য। এই কাব্যের রচয়িতাগণ শায়ের নামে পরিচিত ছিলেন।

পুঁথিসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

আরবি-ফারসি-হিন্দি শব্দের বাহুল্যপূর্ণ ব্যবহার, আরবি-ফারসি শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার এবং হিন্দি ধাতুর প্রয়োগ, অনুসর্গ ও উপসর্গরূপে বাংলা ও আরবি-ফারসি-হিন্দি শব্দের প্রয়োগ, ফারসি বহুবচনের ব্যবহার, পুংলিঙ্গ বাংলা স্ত্রীবাচক শব্দের প্রয়োগ ইত্যাদি। এতে আরবি ফারসি হিন্দি শব্দ, প্রত্যয়, বাক্য বা বাক্যাংশ বাংলার সঙ্গে মিশিয়ে একটা কৃত্রিম ভাষারীতি হিসেবে রূপ দেওয়া হয়েছে।

পুঁথিসাহিত্যের প্রকারভেদ

বিষয়বস্তু অনুসারে পুঁথি সাহিত্যকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যায়: ১) প্রণয়োপাখ্যান জাতীয় কাব্য: ইউসুফ-জোলেখা, সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল, লায়লী-মজনু, গুলে-বকাওলী ইত্যাদি। ২) যুদ্ধ সম্পর্কিত কাব্য: জঙ্গনামা, আমীর হামজা, সোনাভান, কারবালার যুদ্ধ ইত্যাদি। ৩) পীর পাঁচালী: গাজী-কালু চম্পাবতী, সত্যপীরের পুঁথি ইত্যাদি। ৪) ইসলাম ধর্ম, ইতিহাস নবী-আউলিয়ার জীবনী ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কাব্য: কাসাসুল আম্বিয়া, তাজকিরাতুল আউলিয়া, হাজার মসলা ইত্যাদি। এসব বিষয়বস্তু থেকে লক্ষ করা যাবে যে, বিচিত্র ধরনের উপকরণ পুথি সাহিত্যের উপজীব্য হয়েছিল।

পুঁথিসাহিত্যের কবিগণ

ফকির গরীবুল্লাহ (পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় ফকির গরীবুল্লাহ কাব্য সমূহ ইউসুফ-জোলেখা, জঙ্গনামা, সোনাভান ও সত্যপীরের পুঁথি)।
সৈয়দ হামজা (মনুহর ও মধুমালতী প্রেমকাহিনি নিয়ে রচিত 'মধুমালতী' আমির হামজা, উর্দু 'আরায়েশ মহফিল' কাব্যের অনুবাদ 'হাতেম তাই')।

ফকির গরীবুল্লাহ্

পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি ছিলেন ফকির গরীবুল্লাহ্। তিনি হুগলি জেলার বালিয়া পরগনার অন্তর্গত হাফিজপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর জীবনকাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। গরীবুল্লাহ্ ছিলেন পীরের খানদান। তিনি বড় খাঁ গাজীর ভক্ত ছিলেন এবং গাজী অনুগ্রহ করে গোপনে তাঁকে সাক্ষাৎ দান করেছিলেন বলে কবি উল্লেখ করেছেন। কবির রচনায় 'ফকির গরীব', 'গরীব' ও 'গরীব ফকির' প্রভৃতি ভণিতা ব্যবহার করেছেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (কারও মতে ১৭৬০-৮০ খ্রি.) কাব্যসাধনা করেছিলেন বলে মনে করা হয়। মিশ্র ভাষারীতিতে তাঁর রচিত কাব্যগুলো হচ্ছে: ১. ইউসুফ-জোলেখা, ২ আমীর হামজা (প্রথম অংশ) ৩, জঙ্গনামা, ৪. সোনাভান এবং ৫. সত্যপীরের পুথি। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ঐতিহাসিক যুদ্ধ কাহিনি এবং লৌকিক দেব বা পীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পাঁচালী– মিশ্র ভাষারীতির এই তিনটি প্রধান ধারাই তিনি পুষ্ট করেছেন।

'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যে ফকির গরীবুল্লাহ্ কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কুরআন শরীফ ও বাইবেলে ইউসুফ-জোলেখার কাহিনি নৈতিক উপাখ্যান হিসেবে ব্যক্ত হয়েছে। ফারসি সাহিত্যে ও বাংলায় এই কাহিনি নিয়ে কাব্য রচনাও বিদ্যমান। কবি ফারসি কাব্যের অনুসরণে তাঁর কাব্য রচনা করেন। তবে তাতে তাঁর নিজস্ব কৃতিত্বের পরিচয় মিলে।

'আমীর হামজা' গরীবুল্লাহর অপর কাব্য। কবি এই কাব্যের প্রথমাংশ মাত্র রচনা করেছিলেন। পরে সৈয়দ হামজা তা সমাপ্ত করেন। ফারসি ও উর্দুতে আমীর হামজার কাহিনি কাব্যাকার রূপায়িত হয়েছিল। কবি ফকির গরীবুল্লাহ্ সে সবের অনুসরণে তা বাংলা রূপ দান করেন।

'জঙ্গনামা' ফকির গরীবুল্লাহ্র অন্যতম বিশিষ্ট কাব্য। কারবালার বিষাদময় কাহিনি এই কাব্যের উপজীব্য। কবি ফারসি কাব্য অবলম্বনে জঙ্গনামা রচনা করেছিলেন। কবি এ কাব্যে একদিকে যেমন যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি গভীর বেদনার সুর ফুটিয়ে তুলেছেন।

সৈয়দ হামজা

পুঁথি সাহিত্যের ধারায় কবি ফকির গরীবুল্লাহ্র অনুসারী হিসেবে কবি সৈয়দ হামজার আবির্ভাব। তিনি ১৭৩৩-৩৪ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার ভুরসুট পরগনার উদনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবিতা, পাঁচালী ও ছড়া রচনায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। আনুমানিক ১৭৮৮ সালি তিনি 'মধুমালতী' নামে একটি প্রণয়কাব্য রচনা করেন। তবে কাব্যটি পুঁথি সাহিত্যের ধারার অনুসারে নয়, এর ভাষা পুঁথি সাহিত্যের মতো মিশ্র ভাষারীতি ছিল না। কবি সম্ভবত ফারসি কাব্য থেকে বঙ্গানুবাদ করে এ কাব্যের রূপ দেন।

'আমির হামজা' কাব্যে কবি অসংখ্য যুদ্ধের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য পুঁথির মতো এই কাব্যেও অলৌকিকতা বিদ্যমান। 'জৈগুনের পুঁথি' নামে সৈয়দ হামজা অপর একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। ১৭৯৭ সালে এ কাব্য রচিত।

আধুনিক যুগে পুঁথিসাহিত্যে কেউ কোনো আবেদনের সৃষ্টি করতে পারেনি। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে সৈয়দ আলী আহসান এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'উনিশ শতকের দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের কাব্যগত কোনো মূল্য নেই, তার কারণ, প্রথমত এবং প্রধানত প্রতিভাবান কবির অভাব; দ্বিতীয়ত, ইংরেজি শিক্ষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্রের ফলে বাংলা সাহিত্যের যে পরিবর্তন এল, সে পরিবর্তনের সঙ্গে পুঁথি রচয়িতাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তৃতীয়ত, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার অভাব কাব্যকে প্রাণহীন করেছিল।' তবু একটি ক্ষীণ ধারা এখনও অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে।

মর্সিয়া সাহিত্য

'মর্সিয়া' আরবি শব্দ। এর অর্থ 'শোক প্রকাশ করা'। মধ্যযুগের শোকের বা কান্নার আধার কেন্দ্রিক বিলাপ প্রধান সাহিত্যের নাম মর্সিয়া সাহিত্য। আরবি থেকে ফারসি সাহিত্য হয়ে এ ধরনের সাহিত্য বাংলায় প্রবেশ করেছে। মুসলমানদের মধ্যে শিয়া সম্প্রদায় মর্সিয়া সাহিত্য বিকাশে অধিক প্রেরণা দান করে। এ সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হল কারবালার প্রান্তরে শহীদ ইমাম ও অন্যান্য শহীদের বীরত্ব গাথা।

মর্সিয়া সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

ক) মর্সিয়া সাহিত্য মূলত অনুবাদ সাহিত্য।
খ) এ ধরণের সাহিত্যে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বিদ্যমান।
গ) এ সাহিত্যের মূল সারবস্তু মুসলমানদের বীরত্বের কাহিনি।
ঘ) পাঁচালীর আঙ্গিকে রচিত মর্সিয়া সাহিত্যে পীরের মাহাত্ম্য ও শক্তির বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে।
ঙ) মর্সিয়া সাহিত্যে তৎকালীন সমাজের রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব রয়েছে।

মর্সিয়া সাহিত্যের কবি ও কাব্য

শেখ ফয়জুল্লাহ: (মর্সিয়া সাহিত্যের ১ম কাব্য– 'জয়নবের চৌতিশা')
দৌলত উজির বাহরম খান: 'জঙ্গনামা'
মুহম্মদ খান: 'মক্তুল হোসেন'
সেরবাজ: 'কাশিমের লড়াই'
হায়াত মাহমুদ: 'জঙ্গনামা, 'ফকিরবিলাস'
ফকির গরীবুল্লাহ: 'জঙ্গনামা', 'সোনাভান', 'আমীর হামজা', ইউসুফ জোলেখা', 'সত্যপীর'।

মর্সিয়া সাহিত্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'মর্সিয়া সাহিত্য' নামে এক ধরনের শোককাব্য বিস্তৃ অঙ্গন জুড়ে রয়েছে। তার বিয়োগাত্মক ভাবধারার প্রভাবে আধুনিক যুগের পরিধিতেও তা ভিন্ন আঙ্গিকে এসে উপনীত হয়েছে। শোক বিষয়ক ঘটনা অবলম্বনে সাহিত্যসৃষ্টি বিশ্ব সাহিত্যের প্রাচীন রীতি হিসেবে বিবেচিত। 'মর্সিয়া' কথাটি আরবি, এর অর্থ শোক প্রকাশ করা। আরবি সাহিত্য মর্সিয়ার উদ্ভব নানা ধরনের শোকাবহ ঘটনা থেকে হলেও পরে তা কারবালা প্রান্তরে নিহত ইমাম হোসেন ও অন্যান্য শহীদকে উপজীব্য করে লেখা কবিতা মর্সিয়া নামে আখ্যাত হয়। মর্সিয়া সাহিত্যের উৎপত্তি কারবালার বিষাদময় কাহিনি ভিত্তি করে হলেও তার মধ্যে অন্যান্য শোক ও বীরত্বের কাহিনির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফাগণের বিজয় অভিযানের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনিও এই শ্রেণির কাব্যে স্থান পেয়েছে। 'জঙ্গনামা' নামে বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের কাব্য রচিত হয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ধর্মীয় বিষয়বস্তুর ব্যাপকভাবে স্থান লাভ করেছিল। মর্সিয়া কাব্যের উপাদান বিবেচনা করলে এগুলোকেও ধর্মীয় সাহিত্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়। তবে অপরাপর ধর্মীয় সাহিত্যের সঙ্গে মর্সিয়া সাহিত্যের বিস্তর পার্থক্যও লক্ষ করা যেতে পারে। মর্সিয়া কাব্যের নাম থেকেই অনুধাবন করা যায় যে এগুলো প্রকৃত পক্ষে শোককাব্য। তবে শোক প্রকাশের মধ্যেই এদের উদ্দেশ্য সমাপ্ত হয়নি, যুদ্ধকাব্য হিসেবে এদের গুরুত্বও কম নয়। বীরত্বের কাহিনি এসব কাব্যের প্রধান উপজীব্য। সে জন্য মুসলমানদের জাতীয় গৌরব ও ধর্মীয় মর্যাদার প্রকাশক হিসেবে মর্সিয়া কাব্যের বিশেষ তাৎপর্য অনুধাবন করা চলে। মানবিক বীরত্বের কাহিনি বর্ণিত হওয়ার ফলে মর্সিয়া সাহিত্য মধ্যযুগের সাহিত্যের স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যের ওপর ফারসি, উর্দু, হিন্দির প্রভাবের নমুনা হিসেবেও এদের তাৎপর্য বিবেচনা করা যায়। তবে ভাবানুবাদের বৈশিষ্ট্যের বাইরেও মৌলিকভাবে মর্সিয়া কাব্য রচিত হয়েছে।

মোগল আমলে বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: দৌলত উজির বাহরাম খান, মুহম্মদ খান, হায়াৎ মাহমুদ, জাফর, হামিদ প্রমুখ। ইংরেজ আমলে সৃষ্টি মর্সিয়া সাহিত্য বিষয়ের দিক থেকে যথেষ্ট বৈচিত্রধর্মীয় হয়ে ওঠে।

বাংলা মর্সিয়া সাহিত্যের আদি কবি সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। শেখ ফয়জুল্লাহকে এ ধারায় প্রথম কবি বলে মনে করা হয়ে থাকে। তিনি 'জয়নবের চৌতিশা' নামে কাব্যের রচয়িতা। কাব্যটি আকারে ক্ষুদ্র এবং কারবালার কাহিনির একটি ছোট অংশ অবলম্বনে রচিত। কবির জীবৎকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ বলে মনে করা হয়। তিনি 'জয়নবের চৌতিশা' নামে কাব্যের রচয়িতা। কাব্যটি আকারে ক্ষুদ্র এবং কারবালার কাহিনির একটি ছোট অংশ অবলম্বনে রচিত। কবির জীবৎকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ বলে মনে করা হয়। তিনি একজন প্রতিভাশালী কবি ছিলেন।

দৌলত উজির বাহরাম খান 'জঙ্গনামা' কাব্য রচনা করেছিলেন। কারবালার কাহিনি নিয়ে রচিত 'জঙ্গনামা' বা 'মক্তুল হোসেন' কবির প্রথম রচনা। তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। 'লায়লী মজনু' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।

মুহম্মদ খান

মুহম্মদ খান 'মক্তুল হোসেন' কাব্য রচনা করে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এই কাব্যটি ফারসি 'মক্তুল হোসেন' কাব্যের ভাবানুবাদ। তবে এতে কবির নিজের ভাবনা চিন্তা ও কল্পনা প্রাধান্য লাভ করেছিল। মুহম্মদ খান চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে 'মক্তুল হোসেন' কাব্য রচিত হয়। কবির বৃদ্ধাবস্থায় এটি রচিত। কবি সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্তজীবিত ছিলেন বলে মনে করা হয়।

সেরবাজ

অষ্টাদশ শতকের কবি শেখ সেরবাজ চৌধুরী 'কাশিমের লড়াই' কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির নিবাস ছিল ত্রিপুরা জেলায়। মহররমের একটি ক্ষুদ্র বিবরণী এ কাব্যে স্থান পেয়েছে। বিষয়বস্তু গতানুগতিক এবং তাতে কোনো নতুনত্ব নেই। এই কাব্য ছাড়া তিনি 'মল্লিকার হাজার সওয়াল' ও 'ফাতিমার সূরতনামা' কাব্য রচনা করেছিলেন।

হায়াত মামুদ

অষ্টাদশ শতকের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন হায়াত মাহমুদ। কবি রংপুর জেলার ঝড়বিশিলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'জঙ্গনামা' কাব্য কবির প্রথম রচনা। ফারসি কাব্যের অনুসরণে কাব্যটি রচিত। কাব্যটির রচনাকাল ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দ।

কবি সতের শতকের শেষে জন্মগ্রহণ করেন এবং আঠার শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর অন্যান্য কাব্যের নাম 'চিত্তউত্থান', 'কামালনসিয়ত', 'ফকিরবিলাস', 'হিতজ্ঞানবাণী' ও 'আম্বিয়াবাণী'।

জাফর

জাফর নামক একজন অজ্ঞাতনামা কবি। 'শহীদ-ই-কারবালা' ও 'সখিনার বিলাপ' নামে মর্সিয়া শ্রেণির কাব্য রচনা করেছিলেন। এতে কবির স্বাভাবিক কবি প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে। সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের কোনো এক সময়ে এ কাব্য রচিত হয়।

অন্যান্য কবি

অষ্টাদশ শতকের আর একজন কবি ছিলেন হামিদ। 'সংগ্রাম হুসন' নামে তিনি একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাব্য রচনা করেন। মোগল আমলে আরও অনেক মর্সিয়া কাব্য রচিত হয়েছিল।

ইংরেজি আমলেও বাংলা সাহিত্য মর্সিয়া কাব্যের ধারাটি অনুসৃত হয়েছিল। ফকির গরীবুল্লাহ 'জঙ্গনামা' বাক্য রচনা করেছিলেন। পুথি সাহিত্যের ভাষায় এই কাব্যটি রচিত। তাঁর অন্যান্য কাব্যের নামঃ সোনাভান, আমীর হামজা, ইউসুফ জোলেখা, জঙ্গনামা ও সত্যপীর। মর্সিয়া কাব্য ধারায় রাধারমণ গোপ নামে একজন হিন্দু কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তিনি 'ইমামগণের কেচ্ছা' ও 'আফৎনামা' নামে দুটি কাব্য রচনা করেছিলেন। এগুলো অষ্টাদশ শতকে রচিত হয়েছিল বলে ড. সুকুমার সেন মনে করেন। মর্সিয়া কাব্যের ধারাটি আরও পরবর্তীকাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল।